খবরের কাগজ

সংবাদমন্থন

পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা ১ জুলাই ২০১৩ সোমবার ২ টাকা

Vol 5 Issue 1 1 July 2013 Rs. 2 http://www.songbadmanthan.com

উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ বিপর্যয়ে সাহায্যের আবেদন!

উত্তরাঞ্চলে ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টি ও প্লাবনের কারণে পর্যটক ও তীর্থক্ষেত্র ছাড়াও সেখানকার কয়েক হাজার গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা সেই গ্রামগুলিতে আমাদের সীমিত সামর্থ্যের মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে চাইছি। যোগাযোগ : শমীক (০৩৩–২৪১৪৭৭৩০), জিতেন (০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬), রামজীবন (০৩৫৮২–২৫৮৩৪৬))

• দর্শকাম পৃ ২ • লাইভ গণধোলাই পৃ ২ • বিচার পৃ ২ • চলতে চলতে পৃ ২ • সাইকেল পৃ ৩ • ক্ষীরভবানী পৃ ৩ • রক্তদান পৃ ৩ • ব্রাজিল পৃ ৪

মেগা ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি, অসংখ্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আর পাহাড়ের প্রতি দরদের অভাবে উত্তরাখণ্ড বিপর্যস্ত

সোমনাথ চৌধুরি, রামজীবন ভৌমিক, কোচবিহার, ২৯ জুন •
উত্তরাখণ্ডের ভয়াবহ বন্যা ও ধসে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। উত্তরাখণ্ড ও হিমাচলপ্রদেশ এই দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন। অতিবর্ষণে যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েইছে। সাথে হিমালয় পর্বতমালার ভঙ্গুর প্রকৃতি ও ভূমির ধারণক্ষমতা কম হওয়ায় খুব দ্রুত ধস নেমেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে কিছু মনুষ্য সৃষ্ট কারণ। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিপুল বৃদ্ধির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে রাস্তার নির্মাণ, প্রচুর পরিমাণ পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্যে হোটেল, ধর্মশালার সংখ্যার লাগামছাড়া বৃদ্ধি।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক শ্রী মহারাজ পণ্ডিতের মতে 'হিমালয়ের বহন ক্ষমতার উপর বিশেষ সমীক্ষা চালিয়ে সেই তথ্যের ভিত্তিতে সেই অঞ্চলের উন্নয়নের পরিকল্পনা করা উচিত।' তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'হিমালয়ের মতো নব্যগঠিত পর্বতশ্রেণী ঠিকঠাকই থাকবে, যদি খুব বেশি অত্যাচার না করা হয়। কিন্তু তীর্থস্থানে যাবার রাস্তার অপরিমিত বিস্তার ও সাথে পরিবহন শিল্পের ব্যাপ্তি উত্তরাখণ্ডের পাহাড়কে একবারে ধসিয়ে দিয়েছে। অধ্যাপক উত্তরাখণ্ডে একটি প্রজেক্টে কাজ করার সময়ে লক্ষ্য করেন, ৭–৮ মিনিটের মধ্যে প্রায় ১১৭টি বাস ওঁর সামনে দিয়ে গেল। উত্তরাখণ্ডের পরিবহন দপ্তর এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছে। তাদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, ২০০৫–২০০৬ সালে মোট নথিভুক্ত গাড়ির সংখ্যা ছিল ৮৩,০০০ যা ২০১২–২০১৩ তে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৮০,০০০। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ছোটোগাড়ি জীপ, ট্যাক্সি — যা পর্যটকদের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। যেখানে ২০০৫–২০০৬ সালে নথিভুক্ত হওয়া ছোটো গাড়ির সংখ্যা ছিল ৪,০০০ সেই সংখ্যা ২০১৩ সালে ৪০,০০০ ছাড়িয়েছে।

গঙ্গা তার উচ্চগতিতে ইঞ্জিনিয়ারদের লীলার জায়গা হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলিতভাবে উত্তরাখণ্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্তৃপক্ষ গঙ্গা ও তার বিভিন্ন উপনদী থেকে প্রায় ৯০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এখনও পর্যন্ত ৭০টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করেছে। আর উত্তরাখণ্ডের ১৪টি উপত্যকায় আরও ২২০টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে খননের কাজ চলছে। এর জন্যে যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয় তাতেই ধসের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাচ্ছে। এই নির্মাণ কাজের জন্যে নদীগুলির গতিপথেরও পরিবর্তন করা হবে, কোথাও সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে আবার কোথাও জলাধারের মধ্যে দিয়ে নদীগুলিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এইভাবে ভাগীরথী নদীর প্রায় ৮০% আর অলকানন্দা নদীর প্রায় ৬৫% ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাকিরাও একই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২০১১–২০১২ সালে অসিগঙ্গায় যে বিপর্যয় হয় (হড়পা বানে প্রায় ৭০ জনের প্রাণহানি) তার জন্যে অসিগঙ্গার জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকেই দায়ী করা হয়। বাঁধ তৈরির জন্যে নিয়মিত কৃত্রিম বিস্ফোরণ ঘটানো হচ্ছিল, বিস্ফোরণে পাহাড় থেকে ভেঙে পাথরের টুকরো জমা হচ্ছিল নদীতে। সেগুলো পরিষ্কার না হওয়ায় নদীতে জলস্তর বাড়তে থাকে। এরপর ভারী বৃষ্টি হলে হড়পা বানের সম্ভাবনা বেড়ে যায় কয়েক গুণ। এবারের বিপর্যয়ে উত্তরাখণ্ডে ১২০০ জায়গায় রাস্তা ও ১৪৮টি সেতু ভেঙে পড়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ দপ্তর জানিয়েছে, গত ৩৫ বছরে দিল্লিতে যমুনা নদীর জলস্তর এত বাড়তে আগে কখনও দেখা যায়নি।

স্নাতকস্তরের ছাত্র হরিষ রাওয়াত ২০১০ সালে ভাটওয়ারি অঞ্চলের বড়ো ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আমাদের পাহাড় কখনোই এত ভঙ্গুর ছিল না। কিন্তু উচ্চক্ষমতা যুক্ত যন্ত্রগুলি সেটাকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমরা এখন প্রায়ই ভূমিধসে বিপদের মধ্যে পড়ি।' হরিষবাবুর বাড়ি ভূমিধসে শেষ হয়ে গিয়েছে। মূল বাজারের ২৪টি দোকান সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন এবং লাগোয়া ২৫টি বাড়িও পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে। উত্তরকাশীর বাসিন্দা পেশায় গাড়িচালক শ্রী রামপ্রসাদ তোমার বলেন, 'পাহাড় কেটে ক্রমাগত রাস্তা বানিয়ে বানিয়ে পাহাড়কে দুর্বল করে ফেলা হয়েছে। রাস্তা বানানোর দায়িত্বে যারা আছে, তারা কেউই এই অঞ্চলের অধিবাসী নয়, কাজেই পাহাড়কে তারা বুঝবে কীভাবে? বেশিরভাগ এক্সপ্রেসওয়ে আইনি জটিলতায় আটকে আছে।'

পরিবেশবিদরা এই ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির জন্যে উন্নয়নের কয়েকটি বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে, প্রয়োজনের থেকে বেশি খনন কার্য, সাথে নিয়মিত পাহাড়ে কৃত্রিম বিস্ফোরণ ঘটান রাস্তা তৈরির জন্যে। হোটেল ধর্মশালা রিসর্ট তৈরি করার জন্যে পাহাড় কেটে সমতল জায়গা তৈরি ইত্যাদি। উন্নয়ন বলতে যে ধারণাটা আমাদের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে, কোনো অঞ্চলের উন্নয়ন মানেই সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর তার জন্যে যতরকমভাবে সম্ভব প্রকৃতিকে শোষণ করা হবে আর প্রকৃতিও সেই শোষণ সহ্য করে যাবে। এই পদ্ধতিতে যে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের উন্নয়ন সম্ভব না, সেটা পরিষ্কার।

মেঘভাঙা বৃষ্টির ঘটনা এদেশে নতুন নয়, কিন্তু এত ঘন ঘন হবার কারণ পরিবেশের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হওয়া। মেঘ ভাঙা বৃষ্টির মূল কারণ হল সমন্বিত মেঘেদের বৃষ্টিপাত। ওই অঞ্চলে খুব দ্রুত মেঘের সৃষ্টি হয়। খুব স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মাটি উত্তপ্ত হয়ে জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। নতুন করে মেঘ সৃষ্টি হবার জন্যে যতটা সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন এখানে তার অবকাশ পাওয়া যায় না। একই সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পুরো চক্রটা সম্পূর্ণ হওয়ার সময় দীর্ঘায়িত হওয়ায়, জমা মেঘের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে কয়েকগুণ বেশি থাকায় মেঘ ভাঙা বৃষ্টির ঘটনা ঘটছে। একই সঙ্গে নদীগুলিকে ঘিরে ফেলা হচ্ছে, নদী উপত্যকা ধরে গজিয়ে ওঠা হোটেল ধর্মশালা রিসর্ট ইত্যাদির জন্যে বর্ষার সময়ের নদীতে হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া জল কোথা দিয়ে বের করে দেওয়া যাবে, সেই ব্যাপারে কোনো গঠনগত পরিকল্পনা নেই।

তবে এসব কথা পরিবেশ সচেতন মানুষরা বললেও সরকারের ভ্রূক্ষেপ নেই। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আমার রাজ্যের লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, কারণ পর্যটন মার খাচ্ছে। আমাদের পর্যটনকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে হবে।' কোনো একটি পাহাড়ি অঞ্চলের পর্যটক ধারণ করার একটা ক্ষমতা থাকে। গত বছরের তুলনায় কেদানাথেই পর্যটকের সংখ্যা ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবার। ওই দুর্যোগের সময়ে শুধু কেদারনাথেই ছিলেন এক লক্ষের কাছাকাছি তীর্থযাত্রী। সরকার পর্যটক আকর্ষণ করতে যতটা আগ্রহী, সেই পর্যটকদের নিরাপত্তা সম্পর্কে ততটাই বেখেয়াল। অথচ এই বিপুল লাভের কত শতাংশের অংশীদার উত্তরাখণ্ডের অধিবাসীরা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে।

গড়ে ওঠা রিসর্ট, ধর্মশালাগুলির বেশিরভাগেরই মালিক দিল্লি, মুম্বই, পঞ্জাব, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এমনকী এই অঞ্চলের নথিভুক্ত গাড়িগুলির মালিকানাও সেই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি হাতে। উত্তরাখণ্ডের অধিবাসীদের গাড়ির চালক, পর্যটক গাইড বা নিদেনপক্ষে হোটেলগুলিতে কাজ করার থেকে বেশি কিছু করার নেই। কাজেই ওই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতি বলতে ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি অর্থনৈতিকভাবে কতটা লাভবান হল, তা–ই বোঝানো হয়ে থাকে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী সেই বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির সমর্থনেই সাফাই দিয়েছেন, 'যাঁরা বলছেন মেঘভাঙা বৃষ্টি, ভূমিকম্প, ধস, সুনামি ইত্যাদি মনুষ্যসৃষ্ট, তাঁরা নেহাতই বালখিল্যের মতো কথা বলছেন। শতশত বছর ধরে চলে আসা কেদারনাথের ইতিহাসে এই ধরনের ধ্বংসাত্মক ঘটনার কোনো নজির নেই। হিমালয় অঞ্চলের ৩৭০০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে ৩৩০ মিমি বৃষ্টি খুব অল্প সময়ের মধ্যে হয়েছে — যা কারো পক্ষে অনুমান করা সম্ভব ছিল না।'

কেদারনাথের বিপর্যয়

হড়পা বান আর ভূমিধস উত্তরাখণ্ডে হাজার হাজার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, যাদের অনেকেই পর্যটক। কেদারনাথের স্বজন হারানো হাহাকার নিয়ে বেঁচে ফেরা মানুষদের মধ্যে আলিগড়ের হরি ওম বর্মা একজন। তিনি তাঁর বিয়োগান্তক দুঃখের কথা বর্ণনা করছিলেন আইবিএন লাইভ টিভিতে, ২৪ জুন •
আমি আমার স্ত্রী রেশমি, দুই ছেলে এবং এক মেয়েকে নিয়ে চারধাম যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের সাথে আরও আটজন প্রতিবেশী ছিল। রবিবার ১৬ জুন সকাল দশটার দিকে কেদারনাথ মন্দিরে গিয়ে প্রায় দুই ঘন্টা ধরে পুজো দিই। পুজো শেষ করে আমরা দুপুর বারোটার দিকে বেরিয়ে আসি। তখনই আমরা প্রচুর ভূমিধস আর জলপ্রবাহ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসতে দেখি। আমরা আর রাস্তায় বেরিয়ে বিপদ ডেকে আনতে চাইনি। তাই কেদারনাথের আগ্রা ধর্মশালায় রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিই।

রবিবার রাতে আমরা বারবার ঠাকুরকে ডাকছিলাম। রাতে তেমন কিছুই ঘটল না। সোমবার সকাল সাতটার দিকে মানুষের আর্তচিৎকারে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। জলপ্রলয় জলপ্রলয় বলে চিৎকার করে মানুষ এলোপাথাড়ি ছুটছিল। আমরা যখন বাইরে বের হলাম, তখন দেখি পুরো কেদারনাথ টাউন বন্যাপ্লাবিত।

এরপর চারের পাতায়

'মা বাবা ছেলে মেয়েদের কেদারনাথের মতো জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যেতাম না'

ইন্ডিয়া টুডেতে যুগল পুরোহিতের প্রতিবেদন, ২৬ জুন •
মঙ্গলবার। ১৮ জুন। তখন বিকেল, আমরা আকাশপথে কেদারনাথ টাউন থেকে দেড় কিলোমিটার নিচে নামলাম। আমি ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাবার সাহস করলাম। এই ধ্বংসকাণ্ড আমাকে আমার টিম নিয়ে আসতে বাধ্য করেছে। গত রাত আমরা কাটিয়েছি আমাদের বেস–ক্যাম্প গাজিয়াবাদে। সেটা ছিল হিমালয়ের বরফের ওপরে। চোখের সামনে যা দেখছিলাম সবই ধ্বংসস্তূপ আর বোল্ডার। হেঁটে হেঁটে উঠতে শুরু করলাম। এক ঘন্টা হেঁটে আমরা কেদারনাথ টাউনে পৌঁছানোর দেড় কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলাম। যখন আমরা কেদারনাথে পৌঁছালাম, তখন বুঝতে পারলাম, আমরাই রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে আসা প্রথম উদ্ধারকারী দল যারা এখানে এসে পৌঁছেছি। এখানে কিছু স্থানীয় অধিবাসী আর কিছু পর্যটক ছিল।

আমরা দ্রুত পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা ভাবলাম। মৃত আর জীবিতদের আলাদা করা এবং জীবিত মানুষের খোঁজে লেগে পড়লাম। আমরা ছিলাম ৪৭ জন। আমি প্রথমে ইন্দো–টিবেটান বর্ডার পুলিশে কাজ করতাম। এখন গত তিন বছর যাবৎ ন্যাশানাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সে কাজ করছি। আমি সিকিমের ভূমিকম্পের ধ্বংসকাণ্ড দেখেছি। এছাড়াও অনেক ছোটোখাটো বিপর্যয় সামলেছি, কিন্তু এমন বীভৎসতা আগে কখনও দেখিনি।

প্রকৃতি যেন কেদারনাথে হত্যাযজ্ঞ সাঙ্গ করেছে। দেহগুলি ফালাফালা করে চিড়েছে, মাথাগুলি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। এটা দেখে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কাঁপুনি খেলে গেল। এখানে কিছু বহুতল দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের প্রথম কাজ প্রতিটি বহুতলের ঘরগুলি খুঁজে দেখা, কেউ বেঁচে আছে কি না।

এইসব দৃশ্য আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে। আমার ধারণা এত লোকের মৃত্যু মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

এখানে আকাশে শকুন উড়ছে। কিছু শকুন আর কুকুর মৃতদেহের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমরা এক ঝলকে ৬০টি মৃতদেহ কেদারনাথ টাউনে দেখতে পেলাম।

এরপর চারের পাতায়

এ নৌকা যাত্রীসহ কোনোদিন ডোবেনি, বলে দামোদরের মাঝি ফরিদা

কামরুজ্জামান, বাগনান, ২৮ জুন। কল্পিত স্কেচ শমীক সরকার •
হাওড়া জেলার বাগনান এক নম্বর ব্লকের বাইনান অঞ্চলের পূর্ব বাইনান গ্রামের মেয়ে ফরিদা খাতুন সকাল ছ–টার সময় হাজির দামোদর নদীর ধর্মঘাটার ঘাটে। নিজের ছোট্ট নৌকো নিয়ে। সকাল থেকে একটি দুটি চারটি লোক এবং সাইকেল নিয়ে আরোহীদের নৌকায় করে ধর্মঘাটার ঘাট থেকে দামোদরের ওপারে বাঙালপুরের পারে পৌঁছে দেয়। আবার ওপার থেকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে ধর্মঘাটার ঘাটে ফিরে আসে। সারাদিন ফরিদা খাতুন এই কাজ করে চলে। তারপর সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফেরে। একদিন নয়, দু–দিন নয়, একইভাবে মাঝির কাজ সে করে চলেছে প্রায় সাত বছর। তার বিনিময়ে প্রতি যাত্রী এবং সাইকেল পিছু দু–টাকা করে পায়। এখন বর্ষার জন্য লোক চলাচল খুব বেশি নয়। প্রতিদিন পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন যাত্রী অথবা সাইকেল। তাই প্রতিদিনের গড় রোজগার সত্তর থেকে আশি টাকা। ওই টাকা ফরিদা দিয়ে দেয় তার অসুস্থ বিধবা মায়ের হাতে। তাতে কোনোমতে তাদের দিন গুজরান হয়।

প্রায় ২০ বছর বয়সি চনমনে হাসিখুশি ফরিদা সেভেন পর্যন্ত পড়েছে স্থানীয় বাইনান গ্রাম হাইস্কুলে। অভাবের সংসারে আর পড়াশুনা করতে পারেনি। তেরো বছর বয়স থেকে মাঝির কাজ করে হাল ধরেছে সংসারের। ভরা বর্ষার সময় দুই মাস বন্ধ থাকে এই খাল। তখন সংসার চালাতে কষ্ট হয়।

ফরিদা তার হাত দুটো দেখাতে দেখাতে বলে, কেমন কড়া পড়ে গেছে হাতে। 'দিন দিন যেভাবে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তাতে হাঁপিয়ে উঠেছি। তবে শীতকালে একটু বেশি আয় হয়। তখন ষাট থেকে আশিজন যাত্রী পারাপার করে। কিছু সাধারণ মানুষও নৌকায় করে বেড়ায়। ফলে রোজগার একটু বেশি হয়। ... কোনো উপায় নেই, তাই মাঝির কাজ করে চলেছি।' নদীর দ্রুত বয়ে চলার স্রোতের দিকে তাকিয়ে বলে ফরিদা।

এখন এমনিতেই বর্ষা। তার ওপর ডিভিসি প্রচুর জল ছেড়েছে। তাই জলে এত কারেন্ট। ততক্ষণে ওপার থেকে জনা তিনেক যাত্রী ডাকছে আসবে বলে। ফরিদা নৌকার দড়িটা খুলল। আমিও আমার বাচ্চা ছেলেদুটোকে নিয়ে নৌকায় চড়ে বসলাম। এপার–ওপার করে বাঁধা দড়ি ধরে ধরে ফরিদা নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল ওপারের দিকে। সেখানে দড়িটা গিয়ে বাঁধা পড়েছে একটা শক্ত বড়ো খুঁটায়। তারপর আবার একটা ছোট্ট খুঁটায় বাঁধা। অর্থাৎ অনেকটা রোপওয়ের মতো। সত্যিই মাঝনদীতে স্রোত প্রচণ্ড। নৌকা পারে ভিড়তেই জনাতিনেক লোক, একটি বাচ্চা এবং একটি সাইকেল উঠল নৌকায়। ধীরে ধীরে নৌকা মাঝ নদী পেরিয়ে চলেছে। দূরন্ত বাচ্চাটা নৌকায় বসে জল ছিটোচ্ছে। এমন সময় এক যাত্রী বলল, তোমার নৌকা তো ফুটো, জল ওঠে। তাড়াতাড়ি চলো, নইলে ডুবে যাবে। ফরিদা একটু বিরক্ত বোধ করে। তারপর বলে, 'একবার ফুটো হয়েছিল বলে সবসময় ফুটো হয় নাকি?'

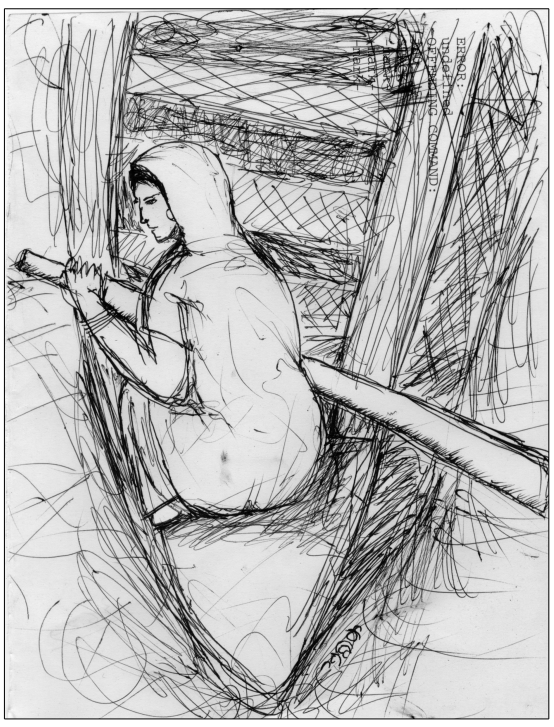

এতক্ষণে নৌকা পারে লেগে গেছে। এক এক করে সবাই নেমে পড়েছে। আমার বাচ্চারাও খুব ছটফট করছিল নৌকায়। খুব সাবধানে তাদের পারে তুলল ফরিদার এক বন্ধু। ফরিদা নৌকাকে ঘাটে বেঁধে দিল। আজকের মতো কাজ শেষ। সন্ধে হয়ে এসেছে। বাড়ি ফেরার পালা এখন। ফরিদার মা–ও এসেছে ঘাটে। সঙ্গে কয়েকজন প্রতিবেশী। একসঙ্গে বসে গল্প করছে। ফরিদাকে জিজ্ঞেস করলাম, এতদিন নৌকা চালানোর সময়ে যদি কোনো ঘটনা থাকে তাহলে বলার জন্য। ফরিদা দূর নদীর দিকে এক পলক চাইল। তারপর বলতে শুরু করল —

'প্রায় এক দেড় বছর আগে, এক বিকেলে কয়েকজন বাচ্চা নৌকায় করে বেড়াচ্ছিল। তখন নদীতে ভাঁটার টান চলছে। নৌকা ঘাটে লেগে গিয়েছে। কয়েকজন নেমে গেছে। জনা চারেক বাচ্চা সহ নৌকাটা হাতছাড়া হয়ে যায়। দ্রুত নৌকা ভাটার টানে বইতে থাকে মাঝনদীর দিকে। বাচ্চারা এবং বাচ্চার গার্জেনরা চিৎকার করতে থাকে। আমরা পার থেকে সবাইকে বলি নৌকায় বসে থাকতে। বসলে নৌকা উল্টাবে না। ফলে কোনো বিপদ ঘটবে না। কিছুদূর যাওয়ার পর স্থানীয় জেলেরা তাদের নৌকা নিয়ে আমার নৌকাকে ধরে পারে আনে। তখন একবার ভয় হয়েছিল। বাচ্চারা যদি এদিক ওদিক করে তবে নৌকা উল্টে যেতে পারত। দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। কিন্তু আমি ঘাবড়াইনি। তীর বরাবর দৌড়ে বাচ্চাদের কী করতে হবে বলে যাচ্ছিলাম সমানে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমার নৌকা যাত্রীসহ কোনোদিন ডোবেনি। আজও ডুববে না। বাচ্চা ঠিক পারে উঠে আসবে।' একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলে ফরিদা।

এরপর তিনের পাতায়

সম্পাদকের কথা

পথ চলতে চাই আত্ম-সম্মানের শিক্ষা

জানি না কী ভেবে আমাদের ছোটোবেলায় পড়ানো হয়েছিল 'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে'! গাড়ির প্রতি আমাদের মোহটা তৈরি করা হয়েছে সেদিন থেকেই। গাড়ি বলতে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনের চোখে আঁকা হয়েছে একটা সুদৃশ্য মোটরগাড়ি। আর একই সঙ্গে গড়ে তোলা হয়েছে পথচারী অন্য সকলের প্রতি অসম্মান। রিকশা, ঠেলা, ভ্যান বা সাইকেল এই অসম্মানিতদের তালিকাতেই পড়ছে। কলকাতা পুলিশের এক বড়ো কর্তা বলেছেন, সাইকেল চালালে ফাইন কেন নেবে, আটক করে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলে দিতে হবে। ভাবুন 'লেখাপড়া'র কী ক্ষমতা আর দম্ভ!

সম্প্রতি নয়ডায় জাতীয় সাইকেল-প্রশিক্ষকের মৃত্যুর পর প্রাক্তন সাইক্লিস্ট প্রশিক্ষক চয়ন চৌধুরি ঠিক এই কথাটাই বলেছেন, 'রাস্তায় সাইকেল-আরোহীদের কোনো সম্মান নেই'।

এ নিয়ে বিলাপ করার কোনো মানে নেই। আমরা যারা পথে হাঁটি, সাইকেল বা অন্য কোনো দূষণহীন যান চালাই, তাদের আত্ম-সম্মান অর্জন করে নিতে হবে। এছাড়া আর কোনো পথ নেই।

নূপুর ও পলাশের মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

দুলাল দাস, কোচবিহার, ২৯ জুন •

নূপুর দাস নাজিরহাট হরকুমারি উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী। বাবা পেশায় মাছ ব্যবসায়ী, মা গৃহকর্মী। প্রতিদিনের মতো ২৪ জুন নিজের গ্রাম খুঁটামারা থেকে নাজিরহাটের দিকে রওনা দেয় টিউশন পড়ার জন্য।

পলাশ সেন। বাবা পেশায় কৃষক। মা ও দিদি বাড়িতে সেলাই মেশিনে দরজির কাজ করে। পলাশ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আর পড়াশুনো করেনি। মোবাইল রিপেয়ারিং-এর কাজ করছিল।

সোমবার সকাল ছ-টার দিকে নূপুর যখন খুঁটামারা থেকে নাজিরহাট যাবার আগে পলাশের বাড়ির কাছে বকুলতলায় পৌঁছায়, তখন পলাশ নূপুরের পথ আটকে ধরে। প্রথমে নূপুরের কান কেটে দেয়। পরে পেট ও পাঁজরের সংযোগস্থলে ছুরি বসিয়ে দেয়। সেখানেই সাথে সাথে নূপুরের মৃত্যু হয়। নূপুরের সাথে থাকা আরও দু-জন বান্ধবী ভয়ে কাতর হয়ে নূপুরের বাড়িতে খবর দিতে চলে যায়।

পলাশ সেখান থেকে প্রথমে বাড়ি যায়। তারপর বাড়ির পাশে নার্সারি স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। পরে জ্যাঠার বাড়ি যায়। সেখানে বমি করে। বমিতে জমিতে ব্যবহারের বিষের গন্ধ বেরোতে থাকে। নূপুরের পরিবার ও প্রতিবেশীরা পড়ে থাকা নূপুরের কাছে এসে পৌঁছায়। পলাশ ইতস্তত ঘোরে। তাকে একটি পুকুরের ধারে বসে থাকতে দেখে ক্ষুব্ধ জনতা তাড়া করলে পলাশ পাটখেতে ঢুকে পড়ে। জনতাও পিছু নেয়। পলাশ দৌড় দিয়ে হরকুমারি স্কুলের দোতলা ঘরের ছাদে উঠে পড়ে। জনতা পাথর ছোঁড়ে। পলাশ নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। তখন সকাল প্রায় সাতটা। দু-জন যুবক ছাদে উঠে যায়। পলাশ তাদের দেখে নিচে লাফ দেয়। একটি বিকট শব্দ হয়। কয়েক সেকেন্ডের জন্য সমস্ত কোলাহল চুপ। কোথাও কোনো শব্দ নেই, পলাশের আর্তনাদ ছাড়া। সকলে বিস্ময়ের সুরে কথা বলতে থাকে। মিনিট পাঁচেক ওভাবেই কাটে। মিনিট পনেরো আগে নাজিরহাট পঞ্চায়েত অফিসে যে পাঁচজন কনস্টেবল থাকে, তার দু-জন এসেছিল। তারা পলাশকে পাহারা দিতে থাকে।

পলাশকে ঘিরে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছিল। তার মধ্যে একজন বলল, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোক। পুলিশ বলল, দিনহাটা থানায় ফোন করা হয়েছে। ওখান থেকে আগে অফিসার আসবে, তারপর যা করার তারাই করবে। সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিটে পলাশ উঠে বসার চেষ্টা করে। আর ভিড়ের মধ্যে থেকে আওয়াজ উঠল, মরেনি, মার শালাকে। আর সাথে সাথেই বৃষ্টির মতো পাথরের ঢিল পড়তে লাগল। একজন ব্যক্তি একটি পাঁচ কেজি ওজনের পাথর পলাশের বুকের ওপর ছুঁড়ে দিল। কেউ কেউ পলাশের অন্ডকোষে লাথি মারল। দু-জন পুলিশ কোনোরকমে তাদের আটকাতে সমর্থ হল। পলাশের দু-জন বন্ধু পলাশকে বাঁচাবার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তারা জনতার মারে রক্তাক্ত নাক মুখ নিয়ে স্কুলঘরের বারান্দায় বসে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। এরপর আবার দূর থেকে পলাশের কান লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়া শুরু হল। একজন একটা বড়ো বাঁশ এনে পলাশকে খোঁচাতে শুরু করল। পলাশের কানদুটো আর চেনা যাচ্ছিল না। একটা রক্তের দলা। পুরো মুখটাই রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল।

আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে অ্যাম্বুলেন্স এল। জনতা বিক্ষোভ দেখিয়ে ভাগিয়ে দিল। আবার মারধোর শুরু হল। এরইমধ্যে রোল উঠল, র‍্যাফ আসছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পুরো মাঠ ফাঁকা। কিছুক্ষণ পরে যখন র‍্যাফ এল না, জনতা আবার মাঠে ভিড় করল। আবার মারধোর। সাংবাদিকের গাড়ি আসায় জনতা অ্যাম্বুলেন্স ভেবে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পরে সাংবাদিক বুঝে ক্যামেরায় যুতসই ছবি নেওয়ার সুবিধে করে দেয়। ন'টা পঞ্চান্ন নাগাদ র‍্যাফ এল। মাঠ ফাঁকা হল। একটা নিঃস্তব্ধ মাঠে নিশ্চুপ হয়ে ছেলেটা শুয়ে রইল। প্রাণ ছিল কিনা ঠাওর করা যায়নি। পুলিশ একটি কালো পলিথিনে জড়িয়ে পলাশকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল। সংবাদমাধ্যমে খবর হল, পলাশের হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে।

পলাশের মা বাবা বোন বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। কিছু লোক পলাশের বাড়ি আগুন দিতে আসে। পড়শিদের প্রতিরোধে আগুন না দিয়ে ভাঙচুর করে। বাদ যায় না সংসারের মহিলাদের উপার্জন করার সেলাই মেশিনদুটিও।

কয়েকদিন পেছনে যাই

পলাশ মেয়েটিকে উত্যক্ত করত বলে খবরে প্রকাশ। মেয়েটির পলাশকে পছন্দ ছিল কিনা জানা নেই। পলাশ মেয়েটিকে উত্যক্ত করত এই অভিযোগের ভিত্তিতে মেয়েটির বাড়িতে পলাশের সালিশি সভা ডাকা হয়। পলাশের পরিবারও উপস্থিত ছিল। সেখানে পলাশকে মারধোর করা হয়। পলাশের বাবাও পলাশকে মারেন বলে শোনা যায়। এটাও শোনা যায় যে, নূপুরকে দিয়ে পলাশকে জুতোপেটা করানো হয়েছিল। কেউ কেউ বলে, দু-তিনদিন আগে নূপুর রাস্তায় পলাশকে জুতো মেরেছিল। আবার অনেকে বলে, খুব ব্যক্তিগতভাবে সালিশি ডাকা হয়েছিল। অনেক পরে সালিশির খবর জানাজানি হয়।

একটি সালিশি প্রসঙ্গ

লিওনার্দো জুনিনের 'দ্য ফার্স্ট ফোর মিনিট' বইয়ে আছে, আফ্রিকার কঙ্গো ও জাম্বিয়া এলাকায় বাবেম্বা নামে এক উপজাতিতে কোনো মানুষ যদি কোনো অপরাধ বা অন্যায় করে, তাহলে তাকে গ্রামের একদম মাঝখানে দাঁড় করানো হয়, একা। তাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়ায় গোটা গ্রাম, সব কাজ ফেলে। তারা একে একে জোর গলায় শোনাতে থাকে, ওই মাঝখানের মানুষটি সারা জীবনে কী কী ভালো কাজ করেছে, কত উপকার করেছে অন্যদের, কত কিছুতে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এই অনুষ্ঠান ততদিন চলে যতদিন না গ্রামের প্রতিটি মানুষের বলা শেষ হয়। শেষে সবাই মাঝখানে থাকা অপরাধীকে ফের কাছে টেনে নেয়। বাবেম্বাদের গ্রামে এই অনুষ্ঠান হয় ৪-৫ বছরে একবার। ওদের মধ্যে অপরাধের হার এইরকমই।

... পলাশ ও নূপুরের মৃত্যুর জন্য কি প্রণয় সম্বন্ধ দায়ী? নাকি আমাদের বিচারব্যবস্থা? যদি ওইদিন সালিশি থেকে পলাশ অপমানিত না হয়ে অনুতপ্ত হয়ে ফিরত, তাহলে হয়তো ছেলেমেয়েদুটো জীবনের মানে খুঁজে পেতেও পারত।

ছাত্রীর শ্লীলতাহানি 'ব্রেকিং নিউজ', গণধোলাই 'লাইভ'

গুরুতর সামাজিক সমস্যা সুরাহার বদলে হিংসার দিকে এগোচ্ছে

বঙ্কিম, অশোকনগর, ২৯ জুন •

একজন মানুষকে একদল লোক পেটাচ্ছে। মহিলারাও মারছে। মানুষটি শিক্ষক, চারদিকে লোকেরা ভিড় করে আছে। সামনের সারিতে টিভি ক্যামেরা। টানটান উত্তেজনা। শিক্ষক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে। দশম শ্রেণীর ছাত্রী। মহিলারা উত্তেজিত। ক্ষতবিক্ষত লোকটির ঠোঁটের কোনা বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। সামনে ক্যামেরা তাক করে 'মিডিয়াদণ্ড' উঁচিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্ন, আপনি কি বিবাহিত? হ্যাঁ। ছেলেমেয়ে আছে? হ্যাঁ, দুটি ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে আছে। 'তবে এমন কাজ করলেন কেন?' অন্য ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করুন, আমি এমন করিনি ...

মুহূর্তে বন্ধুদের ফোন, টিভিতে দ্যাখো, অশোকনগরে এক শিক্ষককে শ্লীলতাহানির দায়ে ধোলাই দিচ্ছে। দ্যাখো ... পার্টির ওপরতলার ফোন কর্মীর কাছে, দ্যাখো, তোমার এলাকায় কী চলছে!

জনগণের তাণ্ডব চলছে। সবকিছুই মিডিয়াবন্দী। ঘটনার কাছাকাছি কোচিং সেন্টারে শিক্ষকের বৃদ্ধা মা থাকেন, সেখানে ভাঙচুর হচ্ছে। ইতিমধ্যে পুলিশ অভিযুক্তকে নিয়ে গেল। ঘটনার আপাত সমাপ্তি। কিন্তু দিনভর টিভি চ্যানেলে 'জ্যান্ত' (লাইভ) থাকল ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে শিক্ষকের ধোলাই পর্ব। ধোলাই চলল গণমনের। শিক্ষক রইলেন জেলে। ছাত্রীটি বিধ্বস্ত, ঘটনার দু-দিন বাদেও সে কাঁদছে, ঠিকমতো কথা বলতে পারছে না। মহিলাদের কাছে একান্তে জানাল তার অবমাননার কথা। থানায় জানানো হয়েছে, 'আনুমানিক একমাস হল আমি কঁচুয়ার মোড়ে স্নেহলতা কোচিং সেন্টারে মাধ্যমিক প্রস্তুতির জন্য ভর্তি হই। অন্যান্য দিনের মতো আজও দুপুরে সেখানে পড়তে যাই। সেখানকার প্রধান অধ্যক্ষ পরিতোষ বিশ্বাস মহাশয় আমাকে আলাদা কক্ষে নিয়ে বসান। লেখাপড়ার মাঝে তিনি আমার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় হাত দিতে থাকেন, আমি ভদ্রভাবে শিক্ষাগুরু পরিতোষবাবুকে এই ধরনের আচরণ করতে মানা করা সত্ত্বেও তিনি আমায় জড়িয়ে ধরে আমার স্তন ও নিম্নাঙ্গে হাত দেন। ভয়ে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে কোনোরকমে বাড়ি ফিরে আসি। এর আগেও তিনি দু-তিনবার একাজ করেছেন।'

বাড়ির লোক জানত না, এফআইআর কপি তুলতে হয়। পরে থানা থেকে তাঁরা কপি তুলেছেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা বারাসত সাবডিভিশন, অশোকনগর থানা, এফআইআর নাম্বার ৩৩৯/১৩, তাং ১৮/০৬/১৩। আইপিসি সেকশন ৩৫৪এ/৩৫৪বি। মেয়েটির মা জানালো, 'আমিও ওনার কাছে কোচিংয়ে পড়েছি, কিন্তু ওনার এমন স্বভাবের কথা জানতাম না। ওইদিন যখন ওনার বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল, তখন ওনার মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছিল।'

কোচিং সেন্টার এলাকার বাসিন্দা প্রবীণা কল্পনা সরকার বেশ জোরের সাথে বললেন, 'আজ বিশ বছর হল পরিতোষকে আমি জানি। ও কখনও মদ খায় না। এমনকী বিড়ি সিগারেটও খায় না। ওরা বলে কিনা পরিতোষ মদ খেয়েছে। ওকে মারার সময় ওরা পরিতোষের মুখে মদ ঢেলে দিয়েছে।' কোচিং সেন্টারের আশেপাশের আরও অনেকেই মাস্টারমশাই যে মদ্যপান করেন না একথা জানালো।

কোচিং সেন্টারের কাছেই থাকে জিৎ সরকার (এইচ এস) ও মৌসুমী সরকার (বি এ)। দুই ভাইবোন। ওরা বলল, ওনার সম্বন্ধে একথা বিশ্বাস করতে পারি না। মৌসুমী বলল, 'আমি ওনার কাছে বিএ-তে ইতিহাস পড়েছি। ওনার কতগুলো ডিসিপ্লিন আছে। যে নোটটা দেবেন, সেটার পড়া ওনার কাছে দিতে হবে, তবে আবার নতুন নোট দেবেন। আর ওই মেয়েটি যখন কোচিং সেন্টার থেকে বেরিয়েছে, তখন ওর সাথে আরও তিনজন ছাত্রী ছিল। ও সাইকেলে গেছে, এখানে কাউকে কিছু বলেনি।'

কয়েকদিন পরে পরিতোষ জেল থেকে ফিরে এসেছেন, কোচিং সেন্টারে আবার পড়ানো শুরু করেছেন। তাঁর শতাধিক ছাত্রছাত্রী আবার আসতে শুরু করেছে। তাঁর সাথে দেখা করতে গেলে উনি বললেন, 'আমি অভিযুক্ত, আমার কথা আপনারা বিশ্বাসই করতে যাবেন কেন। বরং ওই ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। আমি এখানে আজ পঁচিশ বছর টিউশন পড়াই। ওই মেয়েটি একমাসও হয়নি আমার কাছে পড়তে এসেছিল।' এরপর বিষাদগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'দেখি মেয়েটি কীভাবে কোর্টে দাঁড়িয়ে আমার সম্বন্ধে এইসব কথা বলে!'

তথ্য সহায়তা তোজাম্মেল হক।

'তোরা তো জানিস ও কেমন। তবু যদি ওকে মেরে ফেলতে চাস, তবে মেরে ফেল'

বঙ্কিম, অশোকনগর, ২৮ জুন •

একটি রোগা পটকা ছেলেকে মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে নিয়ে চলেছে কয়েকজন লোক। পথের ধারে মানুষ বলছে, এভাবে মারবেন না, ও যে মরেই যাবে। তবুও বাইগাছী থেকে মারতে মারতে তাকে অশোকনগর থানায় নিয়ে চলেছে। প্রায় আধা ঘন্টার পথ। অসহায় ভাবে মার খাচ্ছে চিঁড়ে-চ্যাপটা ছেলেটা। রাজিবুল মোড়ল। বয়েস পনেরো ষোলো বলে মনে হলেও বিশ বছর হবে। এমন নির্মমভাবে পেটানো হচ্ছে কারণ, পাশের বাড়ির মহিলা স্নান করে যখন কাপড় ছাড়ছিলেন, সে লুকিয়ে দেখেছিল। ও মাঝে মাঝেই এমনই করে। উঁকি মেরে মহিলাদের বাথরুমে অথবা স্নান করার সময় লুকিয়ে দেখার চেষ্টা করে। এরজন্য প্রথম ধরা পড়ে বছর আগে। প্রচুর মারধোর খায়। এরপরও কয়েকবার ধরা পড়ে। বেধড়ক ধোলাই খায়। তবুও বদলায় না তার এই অভ্যাস। এরপর এলাকার সমাজকর্মী দীপক চক্রবর্তী ও তোজাম্মেল হকের উদ্যোগে বছর দুই আগে মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ওর মা জামিলা বিবি বলেন, যাওয়া আসার খরচ বাদেও মাসে ওষুধের জন্য প্রায় সাড়ে পাঁচশ টাকা লেগেছিল। আর রাজিবুল বলে, ওষুধ খেয়ে ঠিকমতো সেলাইয়ের কাজ করতে পারছিলাম না, কেমন ঘুমঘুম পেত। ফলে চিকিৎসা শুরুতেই বন্ধ হয়ে গেছে। রাজিবুল এমনিতেও কোনো একটা কাজে লেগে থাকতে পারে না। কখনও সেলাই কখনও মাঠে কখনও বা লরির খালাসির কাজও করেছে। ওর মা বলে, ছেলে যখন এমন করে তো ভাবলাম, বিয়ে দিয়ে দেখি তো যদি ঠিক হয়ে যায়। বিয়ে দিয়েছেনও। সতেরো বছরের পুত্রবধূ ময়রম বিবি সুশ্রী ও বুদ্ধিমতী, সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেও। সে বোঝে সবকিছুই। ওদের বছর দুয়েকের একটা শিশুকন্যা আছে। আর স্বামী-স্ত্রীর বেশ সুসম্পর্ক। আজ স্বামীকে নিয়ে সালতে বাপের বাড়ি যাচ্ছে।

রাজিবুল বলে, অন্য সময় কোনো ব্যাপার না, ঠিকই থাকি। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয়, যে কোনো কিছু ভাবতে পারি না। গা গরম হয়ে যায়। মাথা কেমন করে। লুকিয়ে মহিলাদের নগ্ন অবস্থায় দেখার চেষ্টা করি। কখনও কাউকে ছুঁই না বা ধরিও না। ইচ্ছাও হয় না। স্ত্রী পাশে কাপড় ছাড়লে ফিরেও তাকাই না। ইচ্ছে করে না। বন্ধুদের মোবাইলে কত নগ্ন ছবি, কিন্তু আমার দেখতেও ইচ্ছে করে না। কত কষ্ট করে ঝুঁকি নিয়ে বাথরুমের ছাদ থেকে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করি। যখন ধরা পড়ি, প্রচণ্ড মার খাই। যেন তখন কিছু বুঝতে পারি না। এমনও হয়েছে, আমায় তুলে আছাড় মেরেছে। তবুও বেঁচে আছি। কী যে হয়!

ওর মা বলল, রবিবার ২৩ জুন যখন ও পাশের বাড়ি উঁকি দিয়েছিল, তারপর আমার মেজো ছেলে ওকে মেরে ঘরে বন্ধ করে রাখল। পরে কখন ও লুকিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পাশের বাড়ির লোক ওকে খুঁজে না পেয়ে আমাকে, আমার ছেলে ও স্বামীকে ধরে মারল। কী করব বলুন? আমি ওদের বললাম, তোরা তো জানিস ও কেমন। তবু যদি ওকে মেরে ফেলতে চাস, তবে মেরে ফেল। এরপর ওকে খুঁজে বার করে পাশের বাড়ির লোক দুই ছেলে দুই মেয়ে বাবা মা সবাই মিলে পেটালো। মারতে মারতে থানায় নিয়ে গেল।

এরপরও জামিলা বিবি থানায় গিয়ে পুলিশকে সব কথা বলে। পুলিশ তার কথা শুনে রাজিবুলের সাথে কথা বলে রাতের বেলা ওকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে বলে। মাঝখান থেকে থানায় কোনো একজন জামিনের জন্য তাদের কাছ থেকে তিনশো টাকা নিয়ে নেয়। ২৩ তারিখ এমন ঘটনা ঘটেছে, আজ ২৭ তারিখ পর্যন্ত রাজিবুলকে ডাক্তার দেখানো হয়নি। আজ রাজিবুল তাদের অন্ধকার খুপড়ি স্যাঁতসেঁতে ঘরের মধ্যে মাটিতে শুয়ে পড়েছিল। শরীরে মনে বিধ্বস্ত রাজিবুল।

দর্শকাম বা ভয়ারিজম : সাধারণত নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এমন (মূলত) বিপরীত লিঙ্গের কোনো মানুষের নগ্ন দেহ বা যৌন কার্যকলাপ লুকিয়ে দেখার অভ্যাসকে বলে দর্শকাম বা ভয়ারিজম। সমীক্ষায় দেখা যায়, অন্তত ৫০ শতাংশ পুরুষ দর্শকামী। মনোবিজ্ঞান মতে এটি একধরনের যৌন বিকার। কারোর বাড়াবাড়ি থাকলে বাতিক বা অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডার (OCD) এর মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে এটা অনেক কমিয়ে আনা যায়। সাধারণ আইনে দর্শকাম অপরাধ নয়, তবে কিছু দেশ দর্শকাম-কে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। সাম্প্রতিকতম সংযোজন ভারত।

চলতে চলতে

রোজ কি আর এদের খবর রাখা যায়?

অমিতাভ সেন, কলকাতা, ১ জুন •

বর্ষা কি আগে এসে পড়ছে? জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি ভাদ্র মাসের মতো আকাশে মেঘ, প্যাচপ্যাচে গরম। রোদ উঠল না। এসে পড়ল নিম্নচাপ। পাড়ার বন্ধুর বাড়িতে গেছিলাম আরেক বন্ধুর ছেলেকে ইসকুলে ভর্তি করার টাকা ধার করতে। আমাদের ঘরে টাকা বাড়ন্ত। দেখে এলাম ওদের পরিবারের আরেকজন জ্বরে পড়েছে। ভাইরাল ফিভার। আমাদের ঘরেও চলছে। কলকাতায় এ সময়ে এই জ্বরের ভাইরাস ঋতুচক্রের মতোই ফিরে ফিরে আসে। শুনে এলাম বন্ধুর শ্বশুর বাড়ি থেকে খবর এসেছে – ওখানে খুব ঝড়বৃষ্টি। ওরা ভয় পাচ্ছে। ওদের সুন্দরবনের কাছে বাড়ি– নদীর ধারেই।

খানিক আগে চুল কাটতে গিয়েছিলাম ইটালিয়ান সেলুনে – মানে ফুটপাথে ইট পাতা নাপিতের দোকানে। অবশ্য এখন সেখানে জারুলগাছের নিচে ইটের বদলে ছোটো টুল পাতা। সেখানে সুরেশ ঠাকুরের কাছে চুলদাড়ি ছাঁটা এখনো ২০ টাকায় হয়ে যায়। টুলে বসতে সুরেশদা গায়ে একটা সাদা কাপড় জড়িয়ে দেন, যে কাপড়টা কলপের ফোঁটা পড়ে পড়ে কালো হয়ে গেছে। আমি যখন গেলাম, তখন সুরেশদা ফতুয়া খুলে খালি গায়ে নারকেল তেল মাখছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, তেল মাখলে গা– জ্বালা একটু কমে। সারা গায়ে তাঁর লাল লাল ঘামাচি।

সুরেশদা দাড়িতে হাত দিতেই পানের দোকানের গোবিন্দ দোকান বন্ধ করে পাশে এসে বসল। বলল, 'সুরেশদা তুই মুসলমানের দাড়ি কাটছিস? দাঁড়া তোর এখানে বসা বার করছি'। সুরেশদা বললেন, 'আমার কাছে হিন্দু-মুসলমান কই আছে, চুলদাড়ি কাটা আমার কাজ, সে যেই হোক কাটতে হবে'। গোবিন্দর মুখে ফিচেল হাসি। আমি গোবিন্দকে বললাম, 'তুই বকবক না করে দেখ আমার দাড়িটা ঠিক করে কাটা হচ্ছে কিনা।' ও বলল, 'শালা কত টাকা দিয়েছিস?' বললাম, '২০ টাকা'। উত্তরে গোবিন্দ বলল, 'হুম, এই তোরা নাকি গরিবকে ভালবাসিস?' আমি বললাম, 'তুই কি এই বেলা ১২টাতেই এক পাত্র চড়িয়েছিস?' ও বলল, 'হ্যাঁ রে ইংলিশ খাচ্ছি, হুইস্কি, খাবি নাকি এক পেগ?' আমি বললাম, 'পাগল, এই গরমে!' গোবিন্দ বলল, 'আরে বিষে বিষক্ষয়।' আমি 'থাক' বলায় ও উঠে চলে গেল।

সুরেশদা হাসছে, 'খেলেই বকবক করবে।' সুরেশদাও অবশ্য খেয়েছে। সকাল সাতটা থেকে এগারোটা চুলদাড়ি কাটার পর সুরেশদা খেতে যায় নান্তা, কচুরি দুটো আর গাঁজাপার্কে পঞ্চু সা'র ঠেক থেকে দশ টাকায় এক গেলাস বাংলা। তারপর আবার কাজে লেগে যায়। মুখে একটু গন্ধ ছাড়া কিছু বোঝা যায় না। হাত কাঁপে না। চশমা ছাড়া দিব্যি কাঁচি চালায় — এই এত বয়সেও।

বয়স কত জিজ্ঞেস করে আমি একটু খোঁচা দিই। সুরেশদা বলতে থাকেন, 'সেই সাতচল্লিশ সালে জন্মেছি। এই যে ডানহাতের গটরায় দাগ দেখছেন – সাতমুখ ফোঁড়া হয়েছিল, কিছুতেই সারছিল না। দেশের বাড়ি থেকে বাবা, বড়োবাবার সঙ্গে চলে আসলাম কলকাতায়, তখন আমার বয়স ১৩ বছর।' সুরেশদার দেশ বিহারের মুঙ্গেরে। ১৯৬০ সালে কলকাতায় এসে বাবার সঙ্গে কাজ শিখেছেন। বাবাও নাপিত ছিলেন। তিনি ঘুরে ঘুরে কাজ করতেন। সুরেশদা ১৯৬৫ সাল থেকে নাপিতের কাজ শুরু করেন। আগে বসতেন গলির ওধারে বকুল গাছের তলায়। সে গাছটা ঝড়ে পড়ে যাওয়ায় এখন এখানে। আমাকে দুঃখ করে বলেন, 'ছোটো ছেলেটা বসে বসে খায়। কত বলি কাজ শিখতে। শিখবে না। বড়ো ছেলেও নাপিতের কাজ শেখেনি, সে গাড়ি চালায়। মেয়ে দুটোর বিয়ে দিয়েছি। দেশে বউ আছে। তাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়। একফোঁটা জমি নেই আমার। কী করব? আমাকে খেটে খেতে হবে। কাজ করব, খাব। আমি রাজনীতি-ফাজনীতি করি না। লালু পরসাদ আগে গরিব আদমি ছিল, মন্ত্রী হল আমির হয়ে গেল। নীতিশকুমারও তাই। আমি ওসব না। এখানে অনেকে বলেছে। আমি বলেছি, না। দেখলাম তো কত। নকশাল আমল – মারপিট, পুলিশের দৌড়াদৌড়ি। এই লালঝাণ্ডার সরকার এল, আগে কোথাও ছিল না, তারপর আবার চলে গেল। এখন নতুন সরকার। আমি কী করব? খাটব, খাব।

এরপর তিনের পাতায়

কাশ্মীরি মুসলিমদের আতিথ্যে ‘ক্ষীর-ভবাণী’ পুজো সারল হাজার হাজার বাস্তুচ্যুত কাশ্মীরি পণ্ডিত

সোমনাথ চৌধুরি, কোচবিহার, ১৯ জুন, ছবি এবং তথ্যের সূত্র ডিএনএ নিউজ •

ইদানিংকালে এক বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইল কাশ্মীর উপত্যকা। সোমবার ১৭ জুন গান্দেরবাল জেলার তুলমুল্লা শহরে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বাৎসরিক মিলনমেলা ‘ক্ষীর-ভবাণী’ উৎসব ছিল। এই উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্যে এগিয়ে এল ওই অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়, ‘কাশ্মীরিয়ৎ’-এর এক অনন্য নজির সৃষ্টি করে। এই জ্যেষ্ঠা অষ্টমী তিথির উৎসবে যোগদান করার জন্য জম্মু এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রায় ৩৫০০০ কাশ্মীরি পণ্ডিতের (যাদের মধ্যে অনেকেই কাশ্মীর ছেড়ে পালিয়েছিল আগে) আগমন ঘটে। উপস্থিত সকল পণ্ডিতদের উষ্ণ অভ্যর্থনা করার জন্যে মন্দিরের বাইরে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রায় কয়েকশো মানুষ দাঁড়িয়েছিল। শুধু পুজোতে সাহায্য করাই নয়, পুরাতন হৃদ্যতা ও পুরোনো সম্পর্ককে নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও ছিল এর মধ্যে। পুজোর উপকরণ বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় দোকান, প্রদীপ-ফুল-দুধ ইত্যাদির পসরা সাজিয়েছিল কাশ্মীরি মুসলিমরাই।

এই অনুষ্ঠানকে সাধুবাদ জানিয়ে ‘অল পার্টি মাইগ্রেন্টস কো-অর্ডিনেশন কমিটি’ বা APMCC সভাপতি শ্রী বিনোদ পণ্ডিত বলেন, ‘দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস অর্জনের প্রকৃত মাপকাঠি এটা’। জেলা উন্নয়ন অধিকর্তা শারমাদ হাফিজের কথা থেকে জানা যায়, বাইরে থেকে আসা পণ্ডিতেরা ওই অঞ্চলের অধিবাসী কাশ্মীরি মুসলিমদের বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে অল্পবয়সিদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে তীর্থযাত্রীদের জল ও ফলের রস সরবরাহ করে।

মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লা সকালে ‘ক্ষীরভবাণী’ পরিদর্শন করেন। যদিও শরণার্থী কলোনিতে বিদ্যুতের সমস্যা নিয়ে তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পরতে হয়।

রক্তদানের বিনিময়ে দামি উপহারের রেওয়াজে রক্তদান আন্দোলনেরই ক্ষতি

সুকুমার হোড় রায়, কলকাতা, ২৭ জুন

১৪ জুন আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবসে মিলিত হল রক্তদান শিবিরের আয়োজক বিভিন্ন ক্লাব, ব্যবসায়ী সমিতি, স্বেচ্ছাসেবী-সমাজসেবী সংস্থা। মতবিনিময় হল রক্তদান ও রক্তদান শিবিরের আয়োজনের বিভিন্ন দিক নিয়ে। আয়োজক ‘লাইফ কেয়ার’, কলকাতার বীরেশ গুহ সরণি (দিলখুশা স্ট্রীট)-তে অবস্থিত ইন্ডিয়ান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহে। আলোচনা সভা শুরু হল রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। তারপর রক্তদান ও তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে স্লোগান তৈরি করে লেখার প্রতিযোগিতা এবং একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন।

প্রারম্ভিক ভাষণে ডি আশীষ ও সভাপতির ভাষণে ডাঃ বিকাশ ভৌমিক বলেন, কয়েকবছর ধরে বেশ কিছু রক্তদান শিবিরের আয়োজক ও রক্তদাতাদের মধ্যে অশুভ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। রক্তদান আন্দোলনকে পণ্যায়ন করা হচ্ছে। অনেক জায়গায় রক্তদান শিবিরের আয়োজকরা রক্তদান করার জন্য দামি হাতঘড়ি, প্রেশার কুকার, টেবিল ফ্যান, কোথাও কোথাও মহিলাদের কানের সোনার দুল অবধি উপহার দিচ্ছে। এর দরুন যেসব ক্লাব সংস্থার সেই রকম আর্থিক সামর্থ্য নেই, তারা রক্তদান শিবির আয়োজন করতে পারছে না। একেই রক্তদান শিবিরের সংখ্যা কমে গেছে। তার ওপর এই কাণ্ড গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো। পশ্চিমবঙ্গে যত রক্তের প্রয়োজন, তার চেয়ে ৫২ শতাংশ রক্ত কম সংগ্রহ হচ্ছে। এরপর যদি আরও রক্তদান শিবির বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে রক্তের গভীর সঙ্কট দেখা দেবে রাজ্যে। অনেক শিবিরেই রক্তদাতাদের সংক্রামক রোগ (যেমন এইডস) আছে কি না পরীক্ষা করা হয় না। কিন্তু রক্তদান শিবিরে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

বিপরীতে আলোচনাসভায় রক্তদান শিবিরের আয়োজকরা বলেন, রক্তদান শিবিরে রক্ত পরীক্ষা করে তারপর রক্ত নেওয়া সম্ভব নয়। ভালো উপহার না দিলে রক্তদাতাদের রক্তদানে উৎসাহিত করা যাবে না, এমনও বলেন তাঁরা।

ডাঃ প্রদীপ মিত্র প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, বর্তমান প্রজন্মের ডাক্তারদের মধ্যে খুব কমই দরিদ্র, দুঃস্থ মানুষদের সেবা করার মানসিকতা ও মনোভাব নিয়ে কাজ করে। ডাক্তারদের উচিত রক্তদাতাদের সংগৃহীত রক্ত যেন কোনোরকমভাবে অপচয় ও ভুল ব্যবহার না হয়, তার জন্য সচেষ্ট ও সতর্ক থাকা। একজন রোগীর জন্য যতটুকু রক্তের প্রয়োজন সেই পরিমাণ রক্ত দেওয়ার জন্যই ব্যবস্থাপত্রে (রিকুইজিশনে) লেখা উচিত, তার বেশি নয়। একজন রক্তদাতার রক্ত তিন-চার জন মানুষের কাজে লাগে ও প্রয়োজন মেটায়। রক্ত দিলে দেহের রক্ত কমে যায় না। শরীরের অস্থি মজ্জা থেকে সেই রক্ত আবার তৈরি হয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে লোক সমাগম ভালোই হয়েছিল, একটু বেলার দিকে উপচে পড়ছিল ভিড়। সেই তুলনায় ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন প্রাঙ্গণে রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদানে তেমন উৎসাহ দেখা যায়নি।

ক্যানসার জয় করা মানুষদের মিছিল

সুকুমার হোড় রায়, কলকাতা, ১৯ জুন

গত ২ জুন ক্যানসার থেকে বেঁচে ফেরা (ক্যানসার সারভাইভার) দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলকাতার ১৬-এ পার্ক লেন থেকে দীর্ঘ তিন কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এসে পৌঁছায় একটি পদযাত্রা। এই পদযাত্রায় ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের সাথে সাথে ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীর পরিবারের সদস্যরা, ক্যানসারে আক্রান্ত শিশুদের বাবা-মায়েরাও অংশ নেয়। ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত ও চিকিৎসাধীন রোগীরাও এই পদযাত্রায় পা মেলায়। কারো হাতে ছিল জ্বলন্ত মোমবাতি, কারো হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড, ‘আমরা করব জয়’।

সারা বিশ্বে ক্যানসারে আক্রান্তদের ১০ ভাগ আমাদের দেশের মানুষ। ভারতে মহিলাদের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার হার পুরুষদের তুলনায় বেশি। ‘নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস ক্যানসার রিসার্চ ইনস্টিটিউট’-এর ডিরেক্টর ডাঃ আশীষ মুখার্জী জানান, সচেতনতা বৃদ্ধি, জীবন শৈলীর পরিবর্তন ঘটালে বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার উপলক্ষের প্রতিরোধ ও নিরাময় লাভ করা যায়। তিনি বলেন, ক্যানসার ক্রমশ মৃত ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত আমাদের চিকিৎসাধীনে এক-তৃতীয়াংশ রোগীকে নিরাময় করে তুলতে সফল হয়েছি বলে দাবি করেন তিনি।

প্র থ ম পা তা র প র

দামোদরের মাঝি ফরিদা

ফরিদার মা আনসুরা বেগম বলেন, ‘এই ঘাটটা আমরা পঁয়ষট্টি বছর ধরে চালাচ্ছি। ষোলো বছর আগে ছোট্ট ছোট্ট চারটি বাচ্চা মেয়ে রেখে ফরিদার বাবা মারা যায়। তারপর কী করব ভেবে উঠতে পারিনি। তাই বাধ্য হয়ে সংসার চালানোর জন্যই আমার মেয়েরা নৌকার মাঝি হয়েছে। আমার মেয়ে নাজিমা, সোফিয়া, শাকিলা-রা এইভাবেই নৌকা চালিয়ে সংসার চালিয়ে এসেছে। ষোলো বছর ধরে। এখন নৌকা চালাচ্ছে ফরিদা। যা জমিজমা ছিল, বিক্রি করে পরপর তিন মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এখন অসহায় অবস্থায় আছি। আমার প্রতিবেশীরা আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করে। তাতে কোনওমতে সংসার চলে যায়। তবে নৌকা ফুটো বা খারাপ হলে সারানোর টাকা থাকে না। কখনও কোনও কারণে নৌকা যদি রাত্রে ডুবে যায়, তখন প্রতিবেশি শেফালি সাউ দুর্গা রায় রূপা বাগ বাসন্তী হালদার বিথিকা সাউ-রা মিলে নৌকা তুলে দেয়।’

আনসুরা বেগম ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘ষোলো বছর ধরে কষ্টে আছি আমরা। অথচ বাইনান অঞ্চল থেকে আমার এখনও কোনো বিপিএল কার্ড হয়নি। কত অনুনয় বিনয় করেছি পঞ্চায়েতে তবু বিধবা ভাতা পাইনি। কোনো জিআর (পঞ্চায়েত থেকে এককালীন চাল-গম সাহায্য) এবং ত্রিপল পর্যন্ত পাইনি। আগে অঞ্চল সিপিআইএম চালাত। এখন কংগ্রেস চালায়। কেউ কিন্তু আমাদের দেখেনি। আমার মেয়েরা কত কষ্ট করে ষোলো বছর ধরে সংসার চালাচ্ছে। আমার শরীরে অনেক অসুখ আছে। সব জেনেও আমাদের জন্য কিছু করেনি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং প্রধানরা। তাই এইবার আমি পঞ্চায়েত ভোটে ভোট দেব না।’ তখনও দামোদর নদীর স্রোতের দিকে আনমনে চেয়ে ফরিদা। সূর্য পশ্চিমে ডুবছে। আবছা অন্ধকার গ্রাস করেছে চারিদিক। দ্রুত বয়ে যাওয়া নদীর জলে চাঁদের আলো ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। হয়তো ফরিদাদের জীবনের বিষাদের পার ভাঙার শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে দুরন্ত জলের স্রোতের তোড়ে।

‘অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তবু সাইকেল চালাতেই হবে, গাড়িভাড়া দিতে গেলে পেট চলবে না’

ইন্দ্রজিৎ দাস, লিলুয়া, ২৬ জুন •

রবিবার সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরছিলাম। পদ্মপুকুর জলের ট্যাঙ্ক হয়ে আমি কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে উঠি। অন্ধকারে একটা গাড়ি আমাকে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। আমি বাঁদিকে পড়ে যাই। দু-হাঁটু আর দু-হাতে চোট লাগে। রাস্তায় ধূলোবালি ছিল, চামড়া ছিলে যায়, পাথরে চোট লাগে মুখে। আমি ওই অবস্থায় সাইকেলটা তুলে নিয়ে ১৫-২০ মিনিট সাইকেল চালিয়ে দাশনগর হয়ে লিলুয়ায় পৌঁছাই। লিলুয়া চকপাড়ায় আমার বাড়ি। রাত দশটা নাগাদ ঘরে পৌঁছাই। পরদিন ওখানে ডাক্তার দেখাই। তিনি হাতে আর হাঁটুতে ব্যান্ডেজ করে দেন।

আমি পেপার বিক্রি করি। ভোর পৌনে চারটেয় ঘর থেকে বেরিয়ে ধর্মতলায় এজেন্টের কাছে খবরের কাগজ আনতে যাই। সোমবার আর যেতে পারিনি। অন্যদের খবর দিই। সোমবার আমার লাইনে অনেকে পেপার পায়নি। আমার পেপারের লাইন হল বাঁধাবটতলা হয়ে মেটিয়াবুরুজের ওপর দিয়ে হাজিরতন, ঘোষপাড়া আর রবীন্দ্রনগরে। আমার মামাবাড়ি মেটিয়াবুরুজ বাঁধাবটতলায়। ওখানে বেশিরভাগ দিন দিদার কাছে দুপুরে খেয়ে নিই। কোনো কোনো দিন ওখানে থেকেও যাই। কিন্তু বেশিরভাগ দিন বাড়ি ফিরতেই হয়। ঘরে মা আছে, ঠাকুমা অসুস্থ, বাবা বাইরে থাকে। ফেরার সময় আমি বিচালিঘাট থেকে লঞ্চ পার হয়ে বকুলতলায় আসি। ওখান থেকে পদ্মপুকুর জলের ট্যাঙ্ক হয়ে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ধরে লিলুয়ায় যাই।

পেপারওয়ালাদের প্রায়ই অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। এই তো সপ্তাহ দুয়েক আগে খিদিরপুরে দুজন পেপারওয়ালার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। খিদিরপুর মাজারের আগে ট্যাক্সি পার্কিং করে রেখে দেয়। ওরা যখন তখন গেট খুলে দেয়, দেখে না পিছনে কী আছে।

বছর খানেক আগে সকাল সাতটার সময় ফতেপুরে (মেটিয়াবুরুজ) আমায় ট্যাক্সিতে ধাক্কা মেরেছিল। একটা লোক ট্যাক্সি ধোয়, সে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ট্যাক্সিওয়ালারা আমায় হেল্প করেছিল, আমি রামনগর মোড়ে পুলিশের কাছে ডায়েরি করেছিলাম। ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে পেপার আর সাইকেলের ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল সাতশো টাকার মতো।

আমাদের তো উপায় নেই। সাইকেল চালাতেই হবে। গাড়িভাড়া দিতে গেলে পেট চলবে না। কলকাতায় পেপারওয়ালা আর মাছওয়ালাদের পুলিশ কিছুটা ছাড় দেয়। ক-দিন বেরোতে পারছি না। দেখি, শুক্র-শনিবার নাগাদ আবার বেরোতে হবে।

এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির ধাক্কায় ‘খুন’ জাতীয় সাইকেল প্রশিক্ষক রুমা

শমীক সরকার, কলকাতা, ২০ জুন •

নামকরা সাইক্লিস্ট এবং বর্তমান জাতীয় কোচ রুমা চ্যাটার্জি (৫১) গত ১৮ জুন নয়ডার এক্সপ্রেসওয়েতে ২৫ জন সাইক্লিস্টকে ট্রেনিং দেওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয়েছেন। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এবং সাইক্লিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার কোচ ভীম সিং দাহিয়া জানিয়েছেন, রুমা একটি মোটরবাইকে করে সাইকেল আরোহীদের ট্রেনিং দিচ্ছিলেন, কীভাবে সাইকেলে প্যাডেল করতে হয়, কীভাবে সাইকেলের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় প্রভৃতি। এই সময় মেরু প্লাস ট্যাক্সি সার্ভিসের একটি ‘সুইফট ডিজায়ার’ গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে রুমার বাইকে ধাক্কা মেরে উধাও হয়ে যায়। বাইকটি প্রায় ৫০ মিটার দূরে ছিটকে চলে যায়। রুমা বাইক থেকে ছিটকে আকাশে উঠে গিয়ে গাড়িটির কাঁচে পড়েন, তারপর মাটিতে। আর নড়েননি তিনি। পরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। রুমার বৃদ্ধা মা এবং পাঁচ বোন রয়েছে বাড়িতে। দাহিয়া জানিয়েছেন, এই ট্রেনিংটি ওইখানে সপ্তাহে তিনদিন হয়, প্রায় ৭০ কিমি জায়গা নিয়ে। ভোরবেলায় এই ট্রেনিং চলে রাস্তার একদম বাঁদিক দিয়ে, জানিয়েছেন সাইকেল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার সহকারি সম্পাদক ভি এন সিং।

পুলিশ এখনও সুইফট ডিজায়ার গাড়ির চালককে খুঁজে পায়নি। রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অনুযায়ী গাড়িটির মালিক খাতাপত্র মতে পূর্ব দিল্লির নান্দ নগরীর বিজয় সিং নামে এক ব্যক্তি। যদিও বিজয় সিং পুলিশকে জানিয়েছে, ওই নাম্বারের একটি ইন্ডিকা আছে তার, সুইফট ডিজায়ার নেই।

প্রতিভার খোঁজে — ‘চারুচেতনা’ (শেষ পর্ব)

মিত্রা চ্যাটার্জি, সল্টলেক, কলকাতা, ৫ মে •

ছোটোরা বড়ো হল। স্কুল পেরিয়ে কলেজ। আর্থিক অনটন। পড়ার সাথে সাথে জীবিকার সন্ধান। মেয়েদের বিয়ে হল। আইন অমান্য করে অতি অল্প বয়সে। সবচেয়ে আশ্চর্য তাদের কেউ কেউ প্রতিবাদ করে আবার ফিরে এল। থাকতে চাইল চারুচেতনার সাথে যুক্ত হয়ে। যারা ঘরকন্না করতে গেল, ভুলে গেল না চারুচেতনাকে। তাদের সন্তানরা একটু বড়ো হতেই নিয়ে এল চারুচেতনায়, সেখানে একদিন তারা তাদের কষ্টের শৈশবের মধ্যেও সুন্দরকে দেখেছিল।

ছেলেরা যারা বড়ো হয়েও চারুচেতনা ছেড়ে গেল না, তারাই নতুনদের শিক্ষক হয়ে থেকে গেল। ছোটোদের নতুনদের হাতে ধরে শেখানো শুরু করল। জলরঙ, কোলাজ, পোড়া মাটির কাজ।

নানা কারণে কসবা মডার্ন গার্লস স্কুল থেকে চারুচেতনা স্থানান্তরিত হল কসবাতেই সরলা পুণ্যাশ্রমে। এখানে ঘরের সাথে পাওয়া গেল একটা খোলা বাগান। উপরি পাওনা। যা ছোটো ঘরে সম্ভব হত না, তাই তৈরি করার ভাবনা এল মনে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে পোড়ামাটির স্থাপত্যের কাজ-এর চিন্তা করা হল তখন। মাঠে শীতের দুপুরে টানা পনেরো দিন চলল কাজ। গঙ্গা মাটি আনা, তাকে ছানা, মিশেল করা, তারপরেই সে উপযুক্ত হল মূর্তি গড়ার। আপন আনন্দে তাদের মাটি নিয়ে খেলা চলল। নবেন্দু সেনগুপ্ত তাদের তত্ত্বাবধায়ক। মাটি তাঁরও সাথী। খেলার ছলে বেরিয়ে এল নানা অভিব্যক্তি, মানুষের মুখে, পুতুলের মুখে, পাখির চোখে। রোদে শুকানো হল। তারপর ভাটিতে পোড়ানো। অদ্ভুত আনন্দরসে ভরপুর ছিল ছেলেমেয়েরা। অধীর আগ্রহে পুড়িয়ে আসার অপেক্ষায় থাকল। নিজেদের সৃষ্টিতে নিজেরাই অবাক। সুন্দর জিনিসগুলো দিয়ে ২০১১ তে অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শনী হল। শুধু পোড়ামাটির কাজ নয়, ছবি, সেলাই তাও থাকল। ইতিমধ্যে নবেন্দু তাদের আপনজন হয়ে উঠলেন, তাঁর নতুন নতুন ভাবনা পরিকল্পনায় ওদের অবসর সময়টুকু ভরিয়ে রাখলেন।

২০১১ সালের আগস্টে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন প্রেক্ষাগৃহে চারুচেতনার বার্ষিক আনন্দ সম্মেলনে চারুচেতনার ছেলেমেয়েরা আর একটা চমক আনল। মূক-অভিনয় করে। শান্ত দাস, মাইম শিল্পীর নির্দেশনায় ‘পার্ক’ নামে শহরের আজকের পার্কগুলির অবস্থান, অবক্ষয় ও ভবিষ্যৎকে ভাবনায় রেখে মূক-অভিনয় করে দেখাল। করতালির পর করতালিতে ক্ষুদে শিল্পীদের অভিনন্দন জানিয়েছে উপস্থিত দর্শকেরা। সারা বছর ধরে যে নাচ গানের তালিম তারা নেয়, ‘কালমৃগয়া’ নৃত্যনাট্য করে দর্শকের মন ভরিয়ে দিল। অন্যান্যবারে, অন্যসময়ে আরও অনেক নাটক তারা মঞ্চস্থ করেছে। সুকুমার রায়ের ‘অবাক জলপান’ থেকে ‘হ-য-ব-র-ল’ এমনকি ‘গুপী বাঘা’-ও। হাসি কান্না মান অভিমান সব নিয়েই এই পরিবার।

উৎসাহ বেড়েই চলে। এবার তারা আঁকতে বসল বড়ো বড়ো কাচের ওপর রিভার্স পেইনটিং। হঠাৎ যেন ওরা বড়ো হয়ে গেল। রেখা তুলির টানে সোজা সরল রেখার জায়গায় ধরা পড়ল অ্যাবস্ট্রাকশন। রঙ নিয়ে খেলা, রূপ নিয়ে খেলা। আঁকতে আঁকতে কত ছবি পাল্টে পাল্টে গেল। পেল নতুন প্রকাশ।

ছেলেমেয়েদের নিয়ে সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য সহেলি কাপড়ে ’বাঁধনী’র কৌশল শেখাল। ইন্টারনেট ঘেঁটে দূর প্রাচ্যের নানাবিধ কৌশল নিজে আয়ত্ব করে তারপর শেখাল ছেলেমেয়েদের। তা দিয়ে তৈরি হল বাহারী কুশন কভার, খাবার টেবিলের ঢাকা, ডিভাবের ঢাকা, ব্যাগ, হরেক কিছু। প্রদর্শনীতে তারও জায়গা হলো। মন কাড়ল দর্শকদের। প্রতিভার স্ফুরণ। কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল এরা। আত্মবিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আরও কিছু করে দেখাতে চায়। কত অজানার সন্ধানী হয়েছে তারা। সম্প্রতি শুরু করেছে এনামেল পেইন্টিং। শূর এনামেল কোম্পানি শ্রী প্রণববাবু উদার আহ্বানে সবাই মিলে গিয়েছিল ছবি আঁকতে, এনামেল করা ছোটো বড়ো টিনের প্লেট-এ। ছবি আঁকল অক্সাইড পেইন্ট দিয়ে। সঠিক তাপমাত্রায় ফার্নেসে পুড়িয়ে অসাধারণ ছবি দাঁড়াল। জগতের রঙ রূপ যেন ছড়িয়ে পড়েছে এই শিশুদের সামনে, শুধু বাকি তাকে আয়ত্ত্বে এনে ছবি করে তোলা।

সংকীর্ণ পথ থেকে বিস্তীর্ণ পথে পায়ে পায়ে এরা পৌঁছাল। শুধু সচেতন করে দেওয়া এবং লোভ-লালসার রঙিন হাতছানি থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনটুকু হাতে নিয়েছে চারুচেতনার সভ্যবৃন্দরা। শুভ কর্মপথে তারা যেন নির্ভয়ের গান গাইতে গাইতে চলে যেতে পারে। শুভ হোক ওদের পথ চলা, আমরা সকলে মিলে যেন ভালো থাকি।

দ্বি তী য় পা তা র প র

চলতে চলতে

ওসব কেন করব? আপনি দেখেছেন না, আমি এখানেই রাতে শুয়ে থাকি, এই ফুটপাথই আমার ঘর বলুন, দোকান বলুন সব।’

ব্যস, আমার চুলদাড়ি কাটা শেষ। রাতে সত্যিই সুরেশদা এইসব চিরুনি-কাঁচির বাক্স আর দুটো পাথর দিয়ে একটা উঁচু মতন শোয়ার জায়গা বানিয়ে রোজ তার ওপরে শুয়ে অঘোরে ঘুমায়। ঘুমানোর আগে অবশ্য আবার এক পাইট বাংলা খেয়ে আসে। আমি যখন বাড়ি ফিরি তখন দেখি সুরেশদা নাক ডাকাচ্ছে — সে রাত ৮টাই হোক আর ৯টাই হোক। কোনো কোনো দিন সুরেশদার পা বা মাথার অনেকখানি উঁচু সেই কঠিন বিছানা থেকে অনেকটা ঝুলে নিচে পড়ে থাকে। তাতে কিন্তু ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয় না। থাক বাবা এমন ভাবেই। ফুটে না যায়। এই তো কদিন আগে আমাদের পাড়ার মুচি যে সুরেশদার ঠেক থেকে তিনটে দোকান পরে রোল-চাউমিনের চাকা গাড়ির ওপর রাতে ঘুমাত, সে হঠাৎ ঘুমের মধ্যে কবে মরে গেল ভালো করে জানতে পারলাম না। তারও তো রোজকার রুটিন সুরেশদার মতোই দুবেলা বাংলা মদে ভেজা, সেও তো অমন নাক ডাকিয়ে ঘুমাত। আর, একদিন সকালে গিয়ে দেখলাম তার জায়গায় তার ছোটো ছেলেটা বসে জুতো সারাচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম কদিন আগেই তার বাবা মারা গেছে। রোজ কি আর এদের খবর রাখা যায়?

Postal Regn No. KOL RMS/424/2011-2013
Regn no. RNI No. WBBEN/2009/33712

‘কি করন যাইবো? মাছ–ই তো নাই’

দীপঙ্কর দে সরকার, কোচবিহার, ২৯ জুন •

সম্প্রতি কোচবিহার জেলায় মাছের আকাল চলেছে। বছরের এই সময়টা এমনটি হবার কথা ছিল না। কোচবিহার শহরের পাঁচটি বাজারের খোঁজখবর করতে গিয়ে জানা গেল এমন আকাল আরও বেশ কিছুদিন চলবে। কেন এমনটা হল? জিগগেস করতেই উত্তর এল আবদার আলির কাছ থেকে। আমি বাজারে এলেই আবদার চাচার কাছ থেকে মাছ কিনি। আবদার চাচা গত চল্লিশ বছর ধরে মাছের কারবার করছেন কোচবিহার শহরের রাসমেলা ময়দানের পাশের দেশবন্ধু বাজারে। প্রাক বর্ষার বৃষ্টি সত্ত্বেও এমন মৎস্য সঙ্কট সত্যি বিরল। গতকাল দেশবন্ধু মাছের বাজারে মাছ নিয়ে আসা বিক্রেতাদের কাছে খুব সামান্যই স্থানীয় মাছ দেখতে পেলাম, এরপর বাজার ঘুরে শেষপর্যন্ত আমি আবদার চাচার কাছে গিয়ে বললাম,

— চাচা, মাছে তো হাতই দেওয়া যাচ্ছে না, ট্যাংরা–পাবদা ৬০০ টাকা। শিঙ্গি মাগুর ৭০০ টাকা, দারকা পুঁটি ৩০০ টাকা, এমনকী ৫০ গ্রাম ওজনের বাটা পর্যন্ত ৩০০ টাকা কেজি দরে হুহু করে বিক্রি হচ্ছে।

— কিছু করনের নাই। নিতে হইলে ওই দরেই নিতে হইবে। আমরা সবাই অনেক দর দিয়াই কিনা আনছি।

— তাই বলে এত বেশি দাম?

— কি করন যাইব? মাছ–ই তো নাই।

— কেন এই সময়ে মাছ তো থাকার কথা, কিন্তু কেন নাই?

— তা বলতে পারুম না, কিন্তু লোকে কয় ভূটান পাহারের ডলোমাইট বৃষ্টির জলে ধুইয়া আইসা মাছের বারোটা বাজাইতেছে।

— সে না হয় নদীতে মাছ কমেছে, বৈরালী মাছ আর আগের মতো পাওয়া যায় না, তা বলে কি পুকুরের চাষের মাছও থাকবে না?

— কি কইরা থাকব? জমিতে যে বিষগুলান ঢালা হয়, তার অ্যাকশন নাই? মাছ যা পুকুরে ছাড়া হয় তার সিকিভাগও টেকে না।

— কিন্তু আরও অনেক মাছ আছে যা দু–তিন বছর আগেও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত, যেমন ধরো পুঁটি, মৌরলা, কাকিলা, চাপিলা, ট্যাংরা, কলাগাছি, খলিশা, ভ্যাদা, সাঁটি, কৈ, মেনি। এরা গেল কোথায়?

— কী কই? এই মাছগুলান ডিম পাড়নেরই সুযোগ পায় না, তো মাছ হইব ক্যামনে? ডিমগুলান সব মাছের সঙ্গে পাবলিকের প্যাটে যায়। তাছাড়া চাইরদিক এমন হইছে ডিম পাইরলেও সব মনে হয় বাঁচে না।

— আচ্ছা চাচা এইগুলা বন্ধ কইরা আবার স্থানীয় মাছে বাজার ভরন যায় না?

— ক্যাড়া বন্ধ করব?

— কেন? সরকার?

আবদার চাচা শুনে একটু ম্লান হাসি হাসলেন। আমি সে হাসির মধ্যে আর যাই হোক, আশার কোন রূপালি রেখা অন্তত দেখতে পেলাম না।

বর্ধমানের জামালপুরে বুড়োরাজ শিবের পুজো (শেষ পর্ব)

২৮ মে, সুব্রত দাস, বদরতলা, মেটিয়াব্রুজ •

আমরা নিমাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করি, শিবপুজোয় তো বলির প্রচলন নেই, তবু এখানে তা হয় কেন? তিনি বলেন, শিবের সঙ্গে এখানে একত্রে রয়েছে মা চণ্ডী। বলি হয় মা চণ্ডীকে উৎসর্গ করে। এখানে তিনদিন ধরে মেলা চলে। সারাবছরে বৈশাখী পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা, মাঘি পূর্ণিমা এবং বুদ্ধপূর্ণিমাতে এখানে ভক্ত সমাগম হয়। তবে বুদ্ধপূর্ণিমাতেই সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়। যারা এখানে হাতে বেতের লাঠি, গলায় গামছা আর পরনে হাঁটু অবধি ধুতি পরে এসেছে, এরা সন্ন্যাসী। বাবার নামে পাঁচদিন এরা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে।

এরপর ওঠে অস্ত্রধারীদের প্রসঙ্গ। ওই সেবাইত বলেন, এটা অস্ত্র প্রদর্শন নয়। দূর–দূরান্ত থেকে মানুষজন আসছে। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, মালদা থেকে মানুষ আসছে। আগেকার দিনে এখানে বলি দেওয়ার পর বাইরের মানুষ যখন মাংস নিয়ে ফিরত, তখন স্থানীয় গরিব মানুষ সেই মাংস ও পুজোর ফলমূল কেড়ে নিত। সেই সূত্রে নিজেদের মালের রক্ষার্থে অস্ত্র নিয়ে আসত লোকে। তাছাড়া, এক গ্রামের সঙ্গে অপর এক গ্রামের বহুদিনের বিবাদের কারণেও পুজো দিতে আসার সময় নিজেদের রক্ষার্থে গ্রামের লোকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসে। প্রশাসন এ নিয়ে কিছু করতে পারেনি।

আমরা মেলা ও মন্দির চত্বর থেকে ফেরার পরে আমাদের আশ্রয়ে ফিরে আসি। শুনলাম, ভোরবেলা মন্দির চত্বরে বহু মানুষ বলি দিতে আসবে। আমরা রাতে শুয়ে পড়ি। কিন্তু বাজনার প্রচণ্ড আওয়াজে ভোর পাঁচটা নাগাদ ঘুম ভেঙে যায়। বেরিয়ে এসে দেখি মন্দির চত্বরে বলিকাঠের সামনে শ–তিনেক ভেড়া–ছাগল জড়ো করা হয়েছে। উৎসাহী মানুষেরা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারছিল না। যে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানেই চার–পাঁচজন মানুষ পশুটাকে ধরে নিজেদের সঙ্গে আনা ধারালো অস্ত্র দিয়েই বলি সাঙ্গ করছিল আর বাবা বুড়োরাজের জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। এরপর এল বাঁশের সুসজ্জিত মইতে নৈবেদ্য সাজিয়ে ঘোষবাড়ির লোকেরা, খানিক পরে এল দুটো পালকিতে নৈবেদ্য সাজিয়ে বন্দ্যোপাধ্যায়বাড়ির লোকেরা। পুজোপর্ব মিটতেই দেখি, পাশের একটা মাঠে গিয়ে লোকে জটলা করছে। সেখানে মাটির গামলায় ভাত আর বলির মাংস রান্না হচ্ছে। এক চড়ুইভাতির মতো পরিবেশ। কেউ এসেছে রানাঘাট থেকে, কেউ পলাশি, সালার বা মুরারই থেকে। সদ্য আলাপে আমাদের দুপুরে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাল ওরা। অন্য জায়গায় দেখলাম, অনেকে বলির মাংস ভাগ করে হলুদ মাখিয়ে প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে নিয়ে সাইকেলে রওনা দিচ্ছে। আমরাও দুর্লভবাবুর বাড়িতে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত হলাম।

প্র থ ম পা তা র প র

কেদারনাথের বিপর্যয়

আমরা দ্রুত ধর্মশালার একতলা থেকে দোতলায় উঠে গেলাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে জল দোতলায় ঢুকে পড়ল। খুব তাড়াতাড়ি আমরা তিনতলায় উঠে এলাম। বিল্ডিংটি তিনতলাই ছিল। আমাদের আর ওপরে উঠে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা রইল না। মৃত্যু আমাদের শরীরে জড়িয়ে গিয়েছিল। আমরা বাবা ভোলেনাথকে ডাকতে থাকলাম। হায় এখানেও জলে থইথই। হঠাৎ আমাদের পায়ের তলা থেকে একটা বিকট আওয়াজ শুনতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে তিনতলা বাড়িটা তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। নিমেষে আমার পরিবারের সদস্যরা বাড়িটার তলে চাপা পড়ে গেল। আমার স্ত্রী রেশমি, বড়ো ছেলে আমন, ছোটো ছেলে কৃষ্ণ এবং মেয়ে মেঘনা একেবারে ধ্বংসস্তূপে হারিয়ে গেল। আমার প্রতিবেশীদেরও দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমি আংশিকভাবে একটা বড়ো পিলারের নিচে পড়লাম। হঠাৎ দেখি আমার ভাগনা শুভম আমাকে পিলারের নিচ থেকে টেনে বের করল। বেরিয়ে আমার ছেলে আমনকে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কিছুটা ওপরে খুঁজে পেলাম। আমি আর শুভম আমনকে টেনে বের করলাম। আমন জীবিত। কিন্তু আশঙ্কাজনকভাবে। আমার হাতের ওপর ওর শরীরটাকে এলিয়ে ধরলাম। কিন্তু খুব অসহায়ভাবে। তিনঘন্টা ওকে আমি আমার আবেগ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম। হায়। আমার হাতের ওপরই ও মারা গেল।

যারা বেঁচে ছিল, তারা মৃত প্রিয়জনদের অনেক কষ্টে ফেলে রেখে নিরাপদ জায়গায় যাচ্ছিল। আমি আমনের দেহটাকে লেপে মুড়িয়ে একটি ধর্মশালায় রেখে এলাম। ভাবলাম পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলে ফিরে ওর দেহের সৎকার করব।

কেদারনাথের চারদিকে শুধু থেঁতলানো মৃতদেহ। কেউ গুরুতর আহত অবস্থায় অসহায়ের মতো কাতরাচ্ছে। কেউ প্রিয়জনকে কেঁদে কেঁদে খুঁজে যাচ্ছে। কেউ প্রিয়জনের ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। কেউ প্রলাপ বকে বকে কাঁদছে।

প্র থ ম পা তা র প র

ছেলেমেয়ে নিয়ে কেদারে যেতাম না

মৃতদেহের মাংসগুলি বেশ পচে উঠেছে। গণচিতা জ্বালানো ছাড়া উপায় নেই। আজকের মতো আমাদের দলের ডিউটি থেকে অব্যাহতি পেলাম। আমাদের সাথি দল নেমে পড়ল মৃতদেহগুলিকে শনাক্ত করতে।

আমরা জানি, আমাদের দলের কাজ শেষে রাতে আমরা চারদিকে কিছু মৃতদেহের বেষ্টনীতে ঘুমাতে যাচ্ছি। আর সাথিরা তাদের নিয়ে নাড়াঘাঁটা করছে। এছাড়া আমাদের কিছু করার নেই। এটা একটা অদ্ভুত অনুভূতি। বেশিরভাগ দিনই আমরা বিস্কুট খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। আজ কিছুটা পুরি–সবজি হেলিকপ্টার করে দিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেসব গন্ধ ছড়াচ্ছিল। তাই পুরিগুলোকে ফেলে দিতে হল। ভাগ্যক্রমে আমরা একটা ক্ষতিগ্রস্ত খাদ্যভাণ্ডার খুঁজে পাই। তাতে প্রচুর নুডলস এর প্যাকেট ছিল। এখন আমি ফিরে এসেছি। কিন্তু আমার খিদে তৃষ্ণার অনুভূতিগুলি যেন উধাও।

আমি জানি এটা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তবুও আমি রেগে যাচ্ছি। কারণ বেশ কিছুদিন ধরেই টানা বৃষ্টি হচ্ছিল, তবুও কেন রাজ্য সরকার বা মন্দির কর্তৃপক্ষ কেউই কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাল না? আমি সিকিউরিটি ফোর্সে কাজ করি, মূলত পাহাড়ই আমার কর্মস্থল। তাই এটা আমার সাধারণ জ্ঞান যে যখন পরপর কয়েকদিন টানা বৃষ্টি হতে থাকে, তখন এই ঘটনার একটা ভয়াবহ পরিণতি অবশ্যই থাকে। স্বাভাবিকভাবেই সরকার এবং মন্দির কর্তৃপক্ষের অবশ্যই পর্যটক প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল ক’দিনের জন্য। কিন্তু কিছুই হয়নি। কিছুই না।

কেদারনাথে শনিবার ১৫ জুন রাজ্য সরকারের পক্ষে একজন ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেট আর তার একটা ছোটো দল পৌঁছায়। কিন্তু দুর্যোগ মোকাবিলায় তাদের কোনো ভাবনা ছিল না। তারা যেন অপেক্ষা করছিল জলপ্রলয় শুরু হওয়ার জন্য।

আমার মা বাবা চারধাম যাত্রায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসার জন্য আমাকে মাঝে মাঝেই খুব জোর করত। কিন্তু আমি তাদের বিরত করেছি সবসময়। কারণ কী জানেন? ইন্দো টিবেটান বর্ডার পুলিশের কর্মচারী হিসেবে দেখেছি, তীর্থস্থানগুলির করুণ অবস্থা। দেখে আমার সবসময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা হত। যেকোনো সময় একটা বড়ো দুর্যোগ নেমে আসতে পারে। যা হল, তাতে আমার সন্দেহই সত্যি হল।

আমি আমার মা বাবা ছেলে মেয়েদের কখনও কেদারনাথের মতো জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যেতাম না।

খ ব রে দু নি য়া

বাস, ট্রেনের ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভ ব্রাজিলে, সরকারের নতিস্বীকার

কুশল বসু, কলকাতা, ২৯ জুন, তথ্যসূত্র উইকিপিডিয়া। ছবিতে ‘নিখরচায় গণপরিবহণ’ পোস্টার •

বাস, ট্রেন, মেট্রোর মতো গণপরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনবিক্ষোভের সাক্ষী রইল দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ব্রাজিল। সাও পাওলো শহরের মেয়র অনেকদিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ১ জুন থেকে বাড়তে চলেছে বাসের ভাড়া। কিন্তু সেই ঘোষণা ভালোভাবে নেয়নি বাসভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ‘মুভমিনতো পাসে লিভ্র’ সংগঠন, যারা নিখরচায় গণপরিবহণের দাবি করে আসছে অনেকদিন ধরে।

কিন্তু ১ জুন থেকে বাসভাড়া বেড়ে যাওয়ার (৬ শতাংশের মতো) পর থেকেই জনবিক্ষোভ শুরু হয় সাও পাওলো সহ ব্রাজিলের বেশ কয়েকটি শহরে। প্রথম বড়ো প্রতিবাদ হয় ৬ জুন পলিস্তা অ্যাভেনিউতে। ১৩ জুন পুলিশ ওই বিক্ষোভের ওপর রাবার বুলেট নিয়ে চড়াও হতেই আন্দোলন ছড়িয়ে পরে ব্রাজিলের অন্যান্য শহরে। সবচেয়ে বড়ো বিক্ষোভ হয় ১৭–১৮ জুন। রিও ডি জেনেইরোতে সবচেয়ে বড়ো বিক্ষোভে এক লক্ষ মানুষ শরিক হয়। স্থানীয় প্রশাসন ওই বিক্ষোভের ওপর চড়াও হতে অস্বীকার করে। ২১ থেকে ২৩ জুনের মধ্যে ব্রাজিলে গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো জমায়েত দেখা যায়। বাসসহ সমস্ত গণপরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধি বাতিল করা ছাড়াও বিক্ষোভকারীদের দাবির মধ্যে উঠে আসে দুর্নীতির তদন্ত থেকে রাজনীতিকদের ছাড় দিতে চাওয়া একটি প্রস্তাবিত আইনের বিলোপ, জ্বালানি তেল রপ্তানি করে যে আয় হয় তার বেশিরভাগ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার। বিক্ষোভে শিক্ষিত সাদা চামড়ার যুবকদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

জুন মাসের শেষের দিকে সরকার বিক্ষোভকারীদের একের পর এক দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। বাস ট্রেন মেট্রো ভাড়াবৃদ্ধি প্রত্যাহারের ঘোষণা করে বিভিন্ন শহরের মেয়র। ভাড়ার ওপর সরকারি কর সম্পূর্ণ মকুব করা হয়। জ্বালানি তেল বেচে হওয়া আয়ের তিনের চার ভাগ শিক্ষা ও বাকিটা স্বাস্থ্য খাতে খরচের ঘোষণা করা হয়। রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি তদন্তের ছাড় দিতে চাওয়ার প্রস্তাবিত আইনটি বাতিল করা হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ সংস্কার না হলেও সাংবিধানিক সংস্কার গণভোটে ফেলার কথা ঘোষণা করে সরকার।

ব্রাজিলের এই জনবিক্ষোভ যখন চলছে, তখন ব্রাজিলে চলছে ফুটবলের এক মহাযজ্ঞ, কনফেডারেশন কাপ। কিন্তু ফুটবলে না মেতে ব্রাজিলবাসীরা মেতেছে বিক্ষোভে। এবারের কনফেডারেশন কাপ, পরের বছরের ফুটবল বিশ্বকাপ এবং তার দু–বছর পরে অলিম্পিকের আসর বসতে চলেছে ব্রাজিলে এবং এসবের জন্য খরচ হচ্ছে বহু অর্থ। বিক্ষোভকারীরা আওয়াজ তোলে, দেশের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এইসব খেলার মহাযজ্ঞ, নাকি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ?

গার্ডেনরীচ হাসপাতাল দখলদার মুক্ত হোক

২ জুন, অনু মণ্ডল, মেটিয়াবুরুজ •

গার্ডেনরীচ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল গুটিকতক চিকিৎসক, নার্স আর সাফাইকর্মী নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। বর্তমান সরকার এটিকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল করবে বলেছে। কিন্তু কোথায় কি? বিগত জমানায় এই হাসপাতালের একাংশ দখল করেছিল নাদিয়াল থানা। আর বর্তমান জমানায় আরও বড়ো অংশ দখল করেছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশে।

গার্ডেনরীচ–মেটিয়াবুরুজের সিংহভাগ মানুষ সংখ্যালঘু এবং দর্জিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। দর্জিশিল্পের অবস্থাও ভীষণ খারাপ। তাই নব্বই শতাংশ মানুষ দিন–আনা–দিন–খাওয়া হয়ে পড়েছে। তাদের পক্ষে পয়সা খরচ করে স্বাস্থ্য পরিষেবা কেনা দুঃসাধ্য। সরকারি হাসপাতাল কার্যত না থাকায় অলিতে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে হাতুড়ে ডাক্তারদের চেম্বার। তাদের সাইনবোর্ডে জালি ডিগ্রি। এমনকী এই হাতুড়েরাই নার্সিং হোম পর্যন্ত চালাচ্ছে। এইসব হাতুড়েদের চেম্বারেই পাওয়া যাচ্ছে ভেজাল ও নিষিদ্ধ ‘জীবনদায়ী’ ওষুধ, লোকে না জেনে তাই খাচ্ছে। এমতাবস্থায় এলাকাবাসী চায়, সরকার গার্ডেনরীচ হাসপাতালটিকে দখলদার মুক্ত করুক এবং পূর্ণাঙ্গ স্টেট জেনারেল হাসপাতালের পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত করুক।

শ্যামলীদির জন্মদিনে তাঁকে স্মরণ

২৩ জুন, বশিরুদ্দিন ও জিতেন নন্দী •

২৩ জুন বিকেল চারটে থেকে ছটা পর্যন্ত শ্যামলী খাস্তগীরের জন্মদিনে সভা হল পলাশবাড়িতে। গান করেন জ্যোতির্ময় গোস্বামী, পাঠভবনের অষ্টমশ্রেণীর ছাত্রী বলাকা সরেন এবং আশ্রমিক শ্যামল চন্দ।

কলকাতা থেকে আগত নিরঞ্জন হালদার শ্যামলীদির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, শান্তিনিকেতনে ‘কবিগুরু কার র‍্যালি’র সামনে শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ করেছিলেন শ্যামলী। শান্তিনিকেতনের প্রাচীর দেওয়া হল যখন, আরটিআই করে ঠিকাদারদের নাম সংগ্রহ করেছিলেন এবং পূর্বপল্লির ফাঁকা মাঠে সোমনাথ চ্যাটার্জির প্রোমোটারির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, লাথি মেরে উদ্বোধনী ফলক ভেঙে ফেলা হয়।

স্মৃতিচারণ করেন ভিক্ষু প্রজ্ঞালঙ্কার, অহনা বিশ্বাস, মিনতি সেন। মিনতি সেনের বক্তব্যে উঠে আসে পূর্বপল্লিতে ফ্ল্যাট তৈরির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা। সমগ্র সভার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মনীষা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এইদিনই শ্যামলীদির জন্মদিনে সকালে আরেকটি স্মরণ অনুষ্ঠান হয় নবগ্রামে দেবাশিস সেনগুপ্ত আর পরমেশ গোস্বামীর নতুন বাড়িতে। শ্যামলীদি ২০১১ সালেই ওখানে গিয়েছিলেন। জ্যোতির্ময় গোস্বামী বিনা ভূমিকায় তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরেন। দেবাশিস বসে গেলেন হারমোনিয়ামে। বাবলা গিয়েছিল গিটার নিয়ে, সবাইকে গানের সুরে মাতিয়ে দিল। অলোক দত্ত স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন সুন্দর ভঙ্গিতে। স্বরচিত কবিতা পাঠ করল মেমারির সুব্রত পোদ্দারও। ঠিক হল, শ্যামলীদির পলাশবাড়িতে আগামী কোনোদিন আমরা চাষ নিয়ে কথাবার্তার আয়োজন করব। প্রদীপ দত্ত, যোগীনদা, অসিতদাও শ্যামলীদির ভাবনার প্রেক্ষাপটে কিছু ভাব বিনিময় করলেন।

খবরের কাগজ
সংবাদমন্থন
মঙ্গলবার দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যে ৭টার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের কেন্দ্র
বাকচর্চা, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৯; চলভাষ : ৯৮৩৬৯৬১৩৪১
সংবাদ, চিঠি, টাকা, মানি অর্ডার, গ্রাহক চাঁদা পাঠানোর ঠিকানা
জিতেন নন্দী, বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট বড়তলা, কলকাতা ৭০০০১৮
দূরভাষ : ০৩৩–২৪৯১৩৬৬৬, ই–মেল : manthansamayiki@gmail.com
বছরে ২৪টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা ৪০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়।

স্বত্বাধিকারী জিতেন নন্দী কর্তৃক বি ২৩/২ রবীন্দ্রনগর, পোস্ট অফিস বড়তলা, কলকাতা ১৮ হইতে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং আর্ট, ৩২এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।
Printer, Publisher and Owner Jiten Nandi. Printed at Printing Art, 32A Patuatola Lane, Kolkata-9. Published at B23/2, Rabindranagar, PO-Bartala, Kolkata-18. Editor-Jiten Nandi.